International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.115-123
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.10.issue.05W.012

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে ঔচিত্য - একটি পর্যালোচনা

দিলরুবা খন্দকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, দিনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
A key idea in rhetoric, literature, and the arts, decorum refers to what is proper and fitting in terms of language, behavior, or style in a certain situation. Both Indian and Western cultural traditions place a high value on decorum, or proper behavior or conduct, however, they view it from different social and philosophical perspectives. On the other hand, the Indian interpretation of decorum encompasses the harmonious expression of emotions (rasa) and devotion to dharma (righteousness), having been formed by classical literature such as the Nātyaśāstra and anchored in cultural and intellectual traditions. The Western understanding of decorum, on the other hand, is based on Greco-Roman traditions, including Aristotle's ethos and Cicero's eloquence. It emphasizes appropriateness, moderation, and flexibility in social interactions and is seen as a crucial part of virtue ethics. The concept of decorum in Renaissance and Enlightenment ideas expanded to include civility and politeness, reflecting the development of social structures and communication. Both views emphasize decorum as a means of maintaining social cohesiveness, but the Western tradition leans on rhetoric and practical ethics, while the Indian view is more strongly associated with philosophical and religious doctrines. The common importance of decorum is shown by this cross-cultural investigation, despite its differing philosophical and social underpinnings.

Keywords: Decorum, Language, Literature, Indian & Western Poetics, Cross-Culture, Ethics.

এই জগতের সৌন্দর্যের ভাবনার আধার হল ঔচিত্যতত্ত্ব। এখানে আমরা দেখতে পারি যে, ঈশ্বরীয় ব্যাপার এবং মানবীয় ব্যাপার এই দুইয়ের মধ্যে ঔচিত্যের অখন্ড সাম্রাজ্য বিরাজ করে। এই পরিস্থিতিতে দেবলোক হতে মানবলোক পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপে ঔচিত্যতত্ত্বের এক মহনীয় মহত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত অলংকার সাহিত্যের ইতিহাসে ঔচিত্য সম্বন্ধে কী আলোচনা আছে এবং কাব্যের জগতে ঔচিত্যের কতটা গুরুত্ব রয়েছে তার একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনার আগে ঔচিত্য সম্পর্কে একটু সহজবোধ্য ব্যাখ্যা করা হল। ঔচিত্য বলতে উচিত-অনুচিতের বোধ বা অনুভূতিকে বোঝায়। কোনো আনন্দের পরিবেশে যদি দুঃখের বিষয় টেনে আনা হয়, সেটা যেমন ঔচিত্যহীন হয় তেমনি দুঃখের পরিবেশে আনন্দ সঙ্গীত

পরিবেশনও ঔচিত্য হীন হয়ে পড়ে। আবার মানুষ যদি পশুর মত আচরণ করলে এবং পশু মানুষের মত আচরণ করলে এই দুটোই সমাজে ঔচিত্যহীন হয়। সামাজিকতা রক্ষা, দায়-দায়িত্ব, সবকিছুর সাথে ঔচিত্যের একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের বাস্তব জীবনে সবসময় মানুষকে ঔচিত্যের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। তা না হলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হবে না। যদি বলা হয় কাব্যে ঔচিত্য রক্ষা কী করে করা যায়, তাহলে এভাবে বলা যায় যে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, ভাষা, অর্থ, গুণ, অলংকার, কারক, বচন, বিভক্তি, পদ, লিঙ্গ, উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে কবি তার কাব্যকে সার্থক কাব্য এবং রসময় করে তোলে। বাস্তব জগতে যেমন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকগণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ঔচিত্যের নিরিখেই বিচার করেন। কাব্যের ক্ষেত্রেও কবি সমস্ত বিষয় নিয়ে ঔচিত্যের যথাযথ রক্ষা করেন।

লৌকিক জীবনের মানুষের মধ্যে যেমন সঠিকভাবে উচিত-অনুচিতের জ্ঞান থাকে, তেমনি ভাবে অলৌকিক কাব্য জগতেও স্রষ্টা কবিগণের মধ্যেও উচিত-অনুচিতের জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞান না থাকলে কাব্য রচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন ধরনের কাব্যে কী ধরনের চরিত্র উপস্থাপিত করলে, কী রকম সংলাপ উপস্থাপন করলে এবং আচরণ দিলে ঔচিত্যের হানি ঘটবে না বা সংগতিহীন হবে না তাতে কবিগণদের বোধগম্য হওয়া উচিত। কাশ্মীরি পন্ডিত আলংকারিক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র কাব্যের জগতে ঔচিত্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ঔচিত্যবাদী আচার্য ক্ষেমেন্দ্র ‘ঔচিত্যবিচারচর্চা’ গ্রন্থে চমৎকারিত্বের মূল ও রসজীবিত হিসাবে ঔচিত্যকেই চিহ্নিত করেছেন-

> “ঔচিত্যস্য চমৎকারকারিণশ্চারূচর্বণে।
> রসজীবিতভূতস্য বিচারং কুরূতে অধুনা”।।[1]

অর্থাৎ রমণীয় আস্বাদনের ক্ষেত্রে ঔচিত্যই চমৎকার জনক এবং তা রসের প্রাণস্বরূপ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিভিন্ন অলংকারিক বিভিন্নভাবে তাদের অলংকার গ্রন্থে কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের প্রসঙ্গে ঔচিত্যের অবতারণা করেছেন। এদেশে প্রথম ঔচিত্যের আভাস পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। প্রাচীনকাল থেকে এই ঐতিহ্য চলে এসেছে। বিষয়, বক্তা ও ভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি অনুভবের যথার্থ প্রয়োগ যে নানা প্রকার হতে পারে তা জানান। সেই থেকেই ঔচিত্যের কথা মনে আসে। আলংকারিকদের মধ্যে দন্ডী, ভামহ, বামন, রুদ্রট, বিশ্বনাথ, কুন্তক, আনন্দবর্ধন, মম্মট, মহিমভট্ট, ভোজ, জগন্নাথ প্রমুখ ঔচিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁরা ঔচিত্যকে কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলেছেন। কিন্তু কখনোই ঔচিত্যকে কাব্যের আত্মা বলেননি।

ভরতঃ আচার্য ভরতমুনি তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’ এ সমীক্ষা করেছেন যে, মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে তিনি নাটকের স্বরূপ, অভিনয় ইত্যাদির বর্ণনার সাথে অঙ্গভূত সমস্ত কমনীয় কলার বিবরণ দিয়েছেন। নাট্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সংসারে প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র এক নয়। কেউ ধার্মিক, কেউ পাপী, কেউ সদাচারী আবার কেউ কদাচারী, কেউ পরোপকারী বা কেউ স্বার্থী- এরকম নানাভাবসম্পন্ন নানা অবস্থা সম্পন্ন বিষয়গুলো লোকবৃত্তের অনুকরণ অর্থাৎ নাট্য –

> “নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।

[1] ঔচিত্যবিচারচর্চা, কারিকা ৩, পৃষ্ঠা ২

লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্”।।[2]

নাট্যে কোন বস্তুটি গ্রাহ্য হবে আর কোনটি নিন্দনীয় হবে তা ‘লোক’ হতে প্রাপ্ত হয়। তাই ‘লোক’ হল নাট্যের প্রমাণ। অর্থাৎ লোকশাস্ত্রের জ্ঞানকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন-

“লোকসিদ্ধং ভবেদ সিদ্ধং নাট্যং লোকস্বভাবজম্।
তস্মান্নাট্যপ্রয়োগে তু প্রমাণং লোক ইষ্যতে”।।[3]

তিনি বলেছেন- ‘গতিপ্রচারানুগতং চ পাঠ্যম পাঠানুরূপোভিনয়শ্চ কার্যঃ’। অর্থাৎ চরিত্রের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী সংলাপ এবং সংলাপানুযায়ী অভিনয় না থাকলে নাটক রচিত হবে না।

ভামহ: ভামহের ‘কাব্যালংকার’ গ্রন্থেও এই ঔচিত্যের কথা আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন-

“কিঞ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্যাদ ধত্তে শোভামসাধুপি।
কান্তাবিলোচনন্যস্তং মলীমসমিবাঞ্জনম্”।।[4]

আশ্রয়ের সৌন্দর্যের কারণে অসাধুবস্তু সৌন্দর্যকে ধারণ করে। বিশেষভাবে সন্নিবেশ করলে ঔচিত্য সহকারে দুরুক্তবচন সৌন্দর্য বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঔচিত্যের যথাযথ প্রয়োগে ক্রিয়াগুলিকে পুনরুক্তি করলে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি ঘটবে।

দণ্ডী: আচার্য দন্ডী ঔচিত্য বিষয়টাকে ব্যবহার করেননি। তিনি অপার্থ দোষের কথা বলেছেন। বালক, প্রমত্ত, উন্মত্ত এদের ক্ষেত্রে ঔচিত্যের প্রয়োগের কথা বলেন-

“সমুদায়ার্থশূন্যৎ যৎ তদপার্থমিতীষ্যতে।
উন্মত্তমত্তবালানামুক্তেরন্যত্র দুষ্যতি”।।[5]

এছাড়া তিনি দেখিয়েছেন-

“ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা গুণানুবন্ধি প্রতিভানমভূতম্।
শুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্”।।[6]

এখানে পূর্বজন্ম সংস্কারের দ্বারা প্রাপ্ত প্রতিভা, বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা এবং কাব্যে প্রগাঢ় অভিনিবেশ বা শিক্ষণের অভ্যাস- এই তিনটির সমাবেশেই কাব্যের সম্পদ বা কারণ। আচার্য দন্ডী প্রতিভাকে নৈসর্গিকী বা জন্মান্তরের সহজাত অভ্যাস বলে গণ্য করেছেন। ‘প্রতিভা’ হল জন্মগত তাই তিনি একে ’পূর্ববাসনা গুণানুবন্ধি’ বলেছেন। আলস্য ত্যাগ করে নিরন্তর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে বাগদেবীর উপাসনা করে কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি যদি বিভিন্ন শাস্ত্রে যত্নবান হয়ে কাব্য রচনা করেন তাহলে তিনি সমাদর লাভ করবেন। স্বাভাবিক শক্তি থাকলেও প্রযত্ন ছাড়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। তাই বোঝা যায় যে, কবিদের মধ্যে

[2] ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্, ১/১১১, পৃ. ১৭
[3] নাট্যশাস্ত্রম্, ২৬/১১৩
[4] ভামহের কাব্যালঙ্কার, কারিকা ৩৭
[5] দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ, ৪/৫
[6] ঐ ১/১০৪

ঔচিত্যের বোধ রয়েছে বলেই কাব্যরচনা সার্থক লাভ করেছে। তিনি 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে উপমালঙ্কারের বিবেচনা করেন এবং ঔচিত্যের মহত্ত প্রতিপাদন করেন।

আনন্দবর্ধন: খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর বিখ্যাত আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতে ঔচিত্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন-

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎপরা"।।[7]

অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। অনৌচিত্য হল রসের বিনাশক। ঔচিত্যবোধই রসের পরম উপনিষদ এবং কাব্যতত্ত্বের পরাবিদ্যা। ঔচিত্য হল কাব্যবিচারের একমাত্র নিয়ম। অভিপ্রেত রসের উপযোগিতা হল ঔচিত্য। মহাকবিদের প্রধান কবিকর্ম হল ঔচিত্যকে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যে বাচ্য ও বাচকের সমন্বয় ঘটানো। আনন্দবর্ধনের মতে ঔচিত্যযুক্ত রচনাই রসসৃষ্টির সহায়ক হবে। অনৌচিত্যই রসের অপরিপোষকতা করে। একটি রসের বর্ণনা করতে গিয়ে বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা করা উচিত নয়। আকস্মিক ভাবে কোনো রসের বর্ণনা কিংবা কোনো বর্ণনীয় বিষয় যদি হঠাৎ বন্ধ করা হয় তাহলে তখন রসভঙ্গ হবে এবং ঔচিত্য বিরোধী কাজ হবে।

ঔচিত্য সম্পর্কে আনন্দবর্ধনের মূল কথাটি হল যে, মহাকবিরা বিষয় অনুসারে শব্দ নির্বাচন ও ব্যবহার করে রসসৃষ্টি করে থাকেন-

"বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম।
রসাদিবিষয়ে নৈতৎকর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ"।।[8]

অভিনবগুপ্তঃ ঔচিত্য বিষয়ে অভিনবগুপ্ত অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির ঔচিত্যের স্খলন না হলে সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রযত্নের কথা তিনি বলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে বিভাবাদির ঔচিত্য অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, কাব্যের চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে আমাদের কাছে অতিপরিচিত কিন্তু সেই চরিত্রকে নতুনভাবে অঙ্কিত করার অধিকার পরবর্তীকালের কোনো কবির থাকবে কি না আবার রামায়ণের রামচন্দ্রের চরিত্রকে ভিন্ন ভাবে অঙ্কন করলে ঔচিত্য রক্ষা হবে কি না ধর্মপরায়ণ সত্য বীর রামচন্দ্রকে বিকৃত করে যদি অঙ্কন করা হয় তাহলে আমাদের ধর্মভাবে আঘাত লাগবে। আচার্য অভিনবগুপ্তের বক্তব্য হল- কাব্যের বিভাব দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে যে রসের সঞ্চার করে এসেছে তা সিদ্ধরসের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কি না, নতুন ভাবে অঙ্কিত রামের চরিত্রে তা দেখা উচিত।

কুন্তক: অভিনবগুপ্তের পরবর্তী আলংকারিক আচার্য কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিতম' গ্রন্থের প্রথম উন্মেষে ঔচিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি ঔচিত্যকে গুণ হিসাবে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-

"আঞ্জসেন স্বভাবস্য মহত্ত্বং যেন পোষ্যতে।
প্রকারেণ তদৌচিত্যমুচিতাখ্যানজীবিতম্"।।[9]

---

[7] আনন্দবর্ধনবিরচিত ধ্বন্যালোক , তৃতীয় উদ্যোত(বৃত্তি) , পৃ. ১৪০
[8] ঐ পৃ. ১৯০
[9] কুন্তকাচার্যের বক্রোক্তিজীবিতম্ ১/৫৩, পৃ. ১৩৪

অভিধার দ্বারা বস্তুর উৎকর্ষ যখন সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, তখনই ঔচিত্য দৃশ্যমান হয়। আবার যেখানে বর্ণনীয় বিষয়, বক্তা এবং শ্রোতাদের স্বভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তা হল ঔচিতা।

আচার্য কুম্ভক দু’ধরণের ঔচিত্যের আলোচনা করেছেন। প্রথমত, বস্তুর মধ্যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়, এবং দ্বিতীয়ত, কাব্যের যে বর্ণনীয় বিষয় তা বক্তা বা শ্রোতার স্বভাবধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান বা সামঞ্জস্য থাকবে।

এছাড়া ‘বক্রোক্তিজীবিতম’ এর দ্বিতীয় উন্মেষে ২৬ নং কারিকায় কুন্তকাচার্য দেখিয়েছেন যে, যে স্থানে বক্রতা, কালের চমৎকারিতা রয়েছে সেখানে ‘কাল’ ঔচিত্যের কারণেই সুন্দর হয়ে উঠে। তাই কালের চমৎকারিতাই ঔচিত্যের ওপর নির্ভর করে। তিনি একমাত্র রীতির আলোচনা করতে গিয়েই ঔচিত্য নামক গুণের প্রসঙ্গ এনেছেন।

ধনঞ্জয়: আচার্য ধনঞ্জয়ের ’দশরূপক’ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশে ঔচিত্য বিষয়ে বলা হয়েছে।

> “দেশভাষাক্রিয়া বেষলক্ষণাঃ স্যুঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
> লোকাদেবাবগম্যৈতা যথৌচিত্যং প্রযোজয়েৎ”।।[10]

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন প্রবৃত্তিসমূহ প্রকাশিত হবে দেশ, ভাষা, ক্রিয়া এবং বেশ-ভূষার লক্ষণ অনুসারে। সেই সমস্ত প্রবৃত্তিসমূহ লোকব্যবহারের মাধ্যেমে অনুধাবন করে ঔচিত্যের ভিত্তিতে প্রযুক্ত হয়ে থাকবে।

বিশ্বনাথ: আচার্য বিশ্বনাথ ‘সাহিত্যদর্পণ’ গ্রন্থে ঔচিত্য বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন কবির প্রতিভা এবং ঔচিত্যের গুণে কোনো সময় দোষ গুণে পরিণত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদের সর্বশেষ শ্লোকে তিনি দেখিয়েছেনশ যে, স্থল বিশেষে দোষ-অদোষ নির্ধারণ হবে। মনীষিগণ বিচার-বিবেচনা করবেন যে, উচিত-অনুচিত স্থানে দোষ-অদোষ যথাযথভাবে নিরূপণ করবেন। তাই বলা হয়েছে-

> ‘অন্বেষামপি দোষাণামিতৌ-চিত্যান্মনীষিভিঃ অদোষতা চ গুণতা জেয়া চানুময়াঅনা’[11]।

ভোজ: আলংকারিক আচার্য ভোজ তাঁর গ্রন্থে ঔচিত্যের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছয় প্রকারের ঔচিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলি হল- বিষয়ৌচিত্য, বাচ্যৌচিত্য, দেশৌচিত্য, সময়ৌচিত্য, বক্তৃবিষয়ৌচিত্য, অর্থৌচিত্য।

তিনি বিভিন্ন ভাষা যেমন, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্যের ওপরও আলোচনা করেন। মোটকথা তিনি ঔচিত্যের আলোচনাকে রীতি ও ভাষার অঙ্গীভূত করে আলোচনা করেছেন। তিনি বাচ্যৌচিত্যের আলোচনায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্যের সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এছাড়া ভোজরাজের ‘শৃঙ্গারপ্রকাশ’-এ ঔচিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> “ঔচিত্যৎ বচসা প্রকৃতি অনুগতাং সর্বত্র পাত্রচিতা।

---

[10] ধনঞ্জয়ের দশরূপক ২/৬৩, পৃ. ২৬২
[11] সাহিত্যদর্পণ, সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুষ্টিঃস্ববসরে রসঞ্চ চ কথামার্গে চাতিক্রমঃ”।।[12]

অর্থাৎ কথা প্রসঙ্গে রসের ঔচিত্যকে কখনই লঙ্ঘন করা চলবে না। পাত্রচিত শব্দগুলির দ্বারা ঔচিত্যকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, আনন্দবর্ধনের পূর্বে যারা ঔচিত্য বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন তা স্পষ্ট ছিল না। ‘দন্ডী ঔচিত্য’ শব্দটি ব্যবহার না করে পরোক্ষভাবে কিছু ইঙ্গিত দেন। আনন্দবর্ধনের পরবর্তী বিশ্বনাথ, মম্মট, ভোজ, হেমচন্দ্র, প্রমুখ ঔচিত্যকে দোষ-গুণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, পরবর্তী আচার্য কুন্তক, মহিমভট্ট প্রমুখ ঔচিত্যকে স্বীকার করার পর ক্ষেমেন্দ্রই সর্বপ্রথম ঔচিত্যকে তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করেন। অপরদিকে পাশ্চাত্য আলংকারিকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

প্রাচ্যের সাহিত্যতাত্ত্বিকদের আলোচনার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন সমালোচকের নাম পেয়ে থাকি। তারা হলেন- অ্যারিস্টটল, সিসেরো, হোরেস, লনজাইনাস, ক্রোচ, কোলরিজ, ফিলোডেমাস প্রমুখ।

সর্বপ্রথমে গ্রীকের অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিকস’ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির চরিত্রের চারটি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হল ঔচিত্য। ট্র্যাজেডি অসাধারণ স্তরের ব্যক্তির অনুকরণ, তাই সেটাকে একজন ভালো চিত্রকরের অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন নাটকের বহিরঙ্গ ঘটনায় ‘দৈব হস্তক্ষেপ’ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ সেই সব ঘটনা মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে, কারণ দেবতারা হলেন সর্বদর্শী। নাটকীয় ঘটনায় কোনো প্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নয়, তাকে ট্র্যাজেডির বাইরেই রাখতে হবে। পাশ্চাত্যে ‘ডেকোরাম’ এর ভাবনাকে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদরা ঔচিত্য বলেছেন। পোয়েটিকস্ -এর সপ্তদশ অধ্যায়ে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হচ্ছে ট্র্যাজেডির কবির পক্ষে রচিত প্রতিটি দৃশ্যকে আগে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়, যাতে রচনা যথাযথ ও সামঞ্জস্য হয়।

অ্যারিস্টটলের মতো রোমান সমালোচক সিসেরো এই ঔচিত্য বা সমীচীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া, তাই তার রীতিতে কয়েক ধরনের শৈলীর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমীচীনতার আলোচনায় বলেছেন যে, উপদেশ দেওয়ার জন্য সহজশৈলী, সংযত আনন্দদানের জন্য মধ্যমশৈলী এবং মানুষের আবেগকে আলোড়িত করার জন্য মহৎশৈলীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ‘স্টাইলের ভাবনায় ডেকোরাম’ এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। তিনি বলেন যে কোনো একজন উৎকৃষ্ট বক্তা তাঁর পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো স্টাইলেই কথা বলতে পারেন। তাকে সামগ্রিকভাবে সমীচীনতা মেনে চলা উচিত। প্রত্যেকটি জায়গায় বিষয়বস্তু ও স্টাইলের মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য বজায় রাখা উচিত। সিসেরোর মতে একটা ভালো রচনাশৈলীর উদ্দেশ্য হল, উপযুক্ত শব্দাবলীর নির্বাচন যা মানুষ প্রকৃতই ব্যবহার করে। কোনো আলাদা দুর্বোধ্য অপকৃষ্ট ভাষার ব্যবহার করবে না, রচনার মধ্যে এমন কিছু রূপ ও রূপক থাকবে যেটি দৈনন্দিন ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। যে রচনার দ্বারা উন্নত বর্ণময় প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়ে থাকে। সেই প্রকার সমীচীনতা বা ঔচিত্যযুক্ত রচনার কথা তিনি বলে থাকেন। তার মতে শ্রুতিমধুর শব্দাবলী নির্বাচন করতে হবে। যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের আস্বাদন দিতে

[12] ভোজরাজের শৃঙ্গারপ্রকাশ Mad. M.S. Vol. II, পৃ. ৪১১

পারে। এছাড়া তিনি বলেন প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে ছোট ছোট যতি থাকলে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। প্রাচ্যও সিসেরোর মতের সঙ্গে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

রোমান সমালোচক হোরেস-এর সময়কাল ছিল অগাস্টান যুগ। 'ডেকোরাম' কে নতুন মর্যাদা দেওয়া হয় তাঁর সময়কালে। তাঁর গ্রন্থ 'Ars poetica' তে কবিতাকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে।

(ক) Poesis বা বিষয়বস্তু
(খ) Poema বা ফর্মখ) Poema বা ফর্ম
(গ) Poeta বা কবি

হোরেস বিষয়বস্তু বলতে সমীচীনতার ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বিষয়বস্তুর গঠন প্রণালী কাব্যের রীতি ও শব্দাবলী, বিভিন্ন নাটকের চরিত্রে উপযুক্ত রীতি ও স্বরের মাত্রার উপর বিবেচনা করেছেন। তিনি কবিতার বিষয়ে বলে থাকেন যে দুটি লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় ঘটানো বা কবির কাজ হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত করা ও আনন্দ দেওয়া। হোরেসের এই 'সমীচীনতা' বা 'ডেকোরাম' ভাবনা সিসেরোর দিকেও যেমন আলোকপাত করে তেমনি ভাবেই ক্ষেমেন্দ্রের উচিত্যের ভাবনার দিকেও আলোকপাত করে। তিনি বলেন প্রতিটি রীতিকেই নিজের স্থান বজায় রাখা উচিত। এছাড়া কমেডির বিষয়বস্তু যেন ট্র্যাজেডি থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং এই দুটিকে একত্র করা উচিত নয়।

রোমান সমালোচক ফিলোডেমাস অবিচ্ছেদ্যতা হিসাবে উপকরণ ও উপাদানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কবিতার সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করা যাবে যদি তাতে বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। তিনি সমীচীনতার বিষয়ে কালিদাসের 'রঘুবংশম' এর ভূমিকাতেই বলেছেন যে,

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ"।।[13]

এখানে যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে তা হল পার্বতী-পরমেশ্বর যে জগতের পিতা-মাতা তাদের কাছে প্রার্থনা হল কাব্যে বাক ও অর্থের সুসামঞ্জস্য যেন বজায় থাকবে।

সমালোচক ক্রোচ তাঁর 'Aesthetics'-এ বলেছেন যে, কবিরা কাব্যের গতানুগতিক সমস্ত নিয়মকে বিপরীত দিকে চালিত করে। বিশেষ করে মধ্যযুগের কবিরা 'ডেকোরাম' কে গুরুত্ব না দিলেও উদাসীন থেকেছেন। কোনো রেনেসাঁস কবি রীতির সংস্থান এবং রচনাশৈলী, সৌন্দর্য এই প্রকার নির্দেশগুলি মেনে নেননি। এর ফলে কমেডি, ট্র্যাজেডি, রোমান্স, ইতিহাস, কাব্য-কাহিনী, গীতিকবিতা এই সমস্ত কিছুর আবির্ভাব হয়েছিল। কোলরিজ তাঁর 'Biographia Literaria' গ্রন্থে বলেছেন কবিতাকে গ্রাম্যতা থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায় নির্বাচন এবং ছন্দের ব্যবহারের দ্বারা। ইতালীর একজন বিশিষ্ট অভিনেতা Angelo Beolco তিনি Ruzzante নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 'ডেকোরাম' বলতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যা সাহিত্য বিষয়ক কবিতাকে প্রতিপালন করে। তিনি বিশেষ করে সহজ সরল প্রকৃতির সমীচীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তিনি বলেন রচনায় চরিত্রেরা যেন নিজস্ব আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় এবং কর্কশ ভাষাও ব্যবহার করতে পারবেন।

[13] কালিদাসবিরচিত রঘুবংশম্ ১/১, পৃ.৩

সুতরাং বলা যায় ‘ডেকোরাম’ এর বিষয় নিয়ে অ্যারিস্টটল, সিসেরো, লনজাইনাস, কোলরিজ প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ তার গুরুত্ব নিয়ে চর্চা করে থাকলে তা এখনও স্বীকার্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই প্রেক্ষিতে ‘ডেকোরাম’ এর অর্থ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়া থাকবে এবং বিষয় ও শব্দে সাযুজ্য থাকবে। তাই দেখা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে বিচার-চর্চার একইরকম চর্চা আমরা দেখতে পাই। যাইহোক ঔচিত্য বা সমীচীনতার তত্ত্বকে বিভিন্ন আলংকারিকেরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কাব্যের মধ্যে অলংকার, গুণ, রীতি, সমীচীনতা না থাকলে রসের পরিস্ফুট হবে না। ঔচিত্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার বড় কৃতিত্ব হল আচার্য ক্ষেমেন্দ্রের। তিনি রসের ব্যাপারে প্রতিপাদ্য হিসাবে আনন্দবর্ধনের বিচার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং এটাই বলা যায় রসের অন্যতম গোপন তত্ত্বটিই হল সমীচীনতা বা শীলতা। ধ্বনি সমালোচকেরা সমীচীনতাকে গুণ এবং দোষের সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সমীচীনতার ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথিকৃৎ আচার্য ক্ষেমেন্দ্র। আচার্য ক্ষেমেন্দ্র তাঁর ’ঔচিত্যবিচারচর্চা’য় ছন্দোবদ্ধ রচনার বিভিন্ন ঔচিত্যের ধারণার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সাতাশ প্রকার ঔচিত্যের আলোচনায় বিভিন্ন কবির রচনার উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অন্যান্য কাব্যতাত্ত্বিকেরা কাব্যের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গীতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। একটা সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের দ্বারা সমীচীনতা বা অসমীচীনতার প্রমাণ করার জন্য তাত্ত্বিকদের যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকা দরকার। তিনি তার কাব্যের মধ্যে কোথাও কোনো দৃষ্টান্তে ভুল হয়ে থাকলেও সেটা স্বীকার করেছেন। তার প্রত্যয়ের সাহস হল ঔচিত্যের বিচারের একটি অন্যতম দিক।

আমরা যখন প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনায় সমীচীনতা বা ডেকোরাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করি তা আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিক থেকেই বিচার-চর্চার মূল তত্ত্ব এক। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, রেনেসাঁস এবং ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে ’ডেকোরাম’ বা ‘সমীচীনতা’ একটি প্রধান প্রভাবশালী তত্ত্ব ছিল এটা স্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র ও তর্কাচার্য, কালীপদ (সম্পা); আনন্দবর্ধনবিরচিত ধ্বন্যালোক, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা- ১২, তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৪।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীতা (সম্পা); কালিদাসবিরচিত রঘুবংশম্, সংস্কৃত বুক দিপো, কলকাতা, ২০০৩।

৩। দ্বিবেদী, দুর্গাপ্রসাদ (সম্পা.); বিশ্বনাথ-সাহিত্যদর্পণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, মুম্বাই, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯২২।

৪। আচার্য, সীতানাথ ও দাস, দেবকুমার (সম্পা); ধনঞ্জয়-দশরূপক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫। গোপ, যুধিষ্ঠির (সম্পা); দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৯।

৬। শাস্ত্রী, পি. ভি. নাগনাথ (সম্পা); ভামহের কাব্যালঙ্কার, মতিলাল বনারসিদাস পাবলিশার্স লিঃ, দিল্লি, **১৯৯১**।

৭। ঝা, ব্রজমোহন (সম্পা.); ঔচিত্যবিচারচর্চা-ক্ষেমেন্দ্র, চৌখম্বা বিদ্যাভবন। বারাণসী, তৃতীয় সংস্করণ, **১৯৮২**।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.); নাট্যশাস্ত্র-ভরত, নবপত্র প্রকাশন; কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, **১৯৮০**।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর (সম্পা.); বক্রোক্তিজীবিতম্-কুন্তক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, **১৩৯৩** বঙ্গাব্দ।

১০। চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী; অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্কর্ **১৪১৩** বঙ্গাব্দ।

১১। দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার; কাব্যালোক, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, **১৯৯৮**।